শামসুর রাহমান স্মরণে

খালেকুজ্জামান

প্রথম প্রকাশ : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
২৩/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৭১৬৯৮৩০, ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২
ই-মেইল : mail@spb.org.bd

মূল্য : ৬ টাকা

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা কবিতার শক্তিমান প্রতিনিধি এবং পুরোধা কবি শামসুর রাহমান গত ১৭ আগস্ট '০৬ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাংস্কৃতিক দ্বিমাসিক 'পথিকৃৎ' এর পক্ষ থেকে কবির ওপর মূল্যায়নধর্মী একটি লেখা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল - বাসদের আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামানের কাছে চাওয়া হয়। তাঁদের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড খালেকুজ্জামান এই সংক্ষিপ্ত লেখাটি রচনা করেন যা পথিকৃৎ-এর সেপ্টেম্বর ২০০৬ (চুয়াল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এই লেখাটি শামসুর রাহমান ও তাঁর সাহিত্যের সাথে একটা পরিচয় ও ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে – এই প্রত্যাশায় পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হল।

জাহেদুল হক মিলু
সমন্বয়কারী
চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

শামসুর রাহমান স্মরণে

মানবতাবাদের পূজারি, জাতীয়তাবাদের সাধক, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ও প্রগতিশীল কবি শামসুর রাহমান। অর্ধশতাব্দী জুড়ে বাংলার হৃদয়কাব্যে সময়কে কবিতায় গেঁথে চলা এই কবি ৭৭ বছর বয়সে গত ১৭ আগস্ট ২০০৬ চিরবিদায় নিয়েছেন। মরণকে কখনো তিনি শ্যাম-সুন্দর বলে সম্বোধন কিংবা আহ্বান জানাতে পারেন নি; অবধারিত জেনেও অপছন্দ করেছেন সবসময়। সেই মৃত্যুই লক্ষ কোটি মানুষের কামনা-প্রার্থনা ব্যর্থ করে দিয়ে কবিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ১০ দিন ধরে বার্ধক্যপীড়িত জীবন নিয়ে পরাক্রমশালী মৃত্যুর সাথে লড়াই করে সারাদেশের মানুষকে ব্যথাতুর হৃদয়ভারাক্রান্ত করে মায়ের কাছে ফিরে গেছেন। তার ইচ্ছানুযায়ী তার মায়ের কবরেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। দেশের অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, শহীদ মিনারের পাদদেশে রাখা কবির মরদেহে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের উদ্দেশ্যে নামা জনতার ঢল যেন মৃত্যুর ৩১ বছর আগে তার লেখা "একজন কবির প্রয়াণে শহরের পথঘাট গমগম/ করে না মিছিলে – সে সংবাদ কেউ কেউ শোনে কম/ বেশী; কারো শ্রুতির আড়ালে থেকে যায়। গাছপালা/ স্তব্ধ হয়, ফুরায় ফুলের আয়ু আর নদীনালা/ কালো মেঘ রাখে বুকে, পাখিরা মার্শিয়া করে পাঠ ..." –কে হার মানিয়ে গেল।

১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর পুরানো ঢাকার মাহুতটুলীর ৪৬নং বাড়িতে কবি জন্মগ্রহণ করেন। নবাবি আমলে হাতির মাহুতদের বসবাসের সুবাদেই জায়গাটির নাম হয়তো মাহুতটুলী হয়েছিল। তার পৈত্রিক ভিটা ছিল সাবেক ঢাকা জেলার বর্তমান নরসিংদি জেলার রায়পুরা থানার মেঘনাতীরবর্তী পাড়াতলি গ্রামে। শামসুর রাহমানের ডাক নাম ছিল বাচ্চু। তার পিতা মোখলেছুর রাহমান চৌধুরী বৃটিশ আমলে কিছুদিন সাব-ইনস্পেক্টর অব পুলিশ হিসেবে চাকরি করেন। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যাংকের চাকরি করেন, শেষে ব্যবসায় নিয়োজিত হন।

শামসুর রাহমানের পারিবারিক পরিবেশ সংস্কৃতি চর্চার অনুকূল ছিল না। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক, কোরান শরিফ ও বিষাদসিন্ধু ছাড়া ঘরে কোন বই ছিল না। তবে ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি ও মানুষকে নিবিড়ভাবে দেখার একটা মন তার তৈরি হয়েছিল। পাড়ার ছেলেদের ঘুড়ি উড়ানোর দৃশ্য, খট্ খট্ শব্দে চলাচলকারী ঘোড়ার গাড়ি আর হট্ হট্ শব্দে চালক গাড়োয়ান, মশক কাঁধে ভিস্তিওয়ালা, সন্ধ্যায় মই কাঁধে আলো জ্বালানো বাতিঅলা, ইমাম হোসেনের কাব্যের ঘোড়া দুলদুল, দেবী সরস্বতীর মূর্তি, মহল্লায় কাওয়ালী গীত – সবই তার মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ ও অনুভব তৈরি করত। পানি টলটল মেঘনা নদী, বকের ডানায় ছাওয়া চর, চাঁদ-জাগা বাঁশ বাগান, হাওয়ায় ভাসা পাখির মালা, পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্যের হাসি, কাজল দিঘীর শান্ত বুকে ফোটা পদ্ম, আকাশে ঝড়ের আভাস-সহ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতি এক প্রবল টান ছিল তার মধ্যে।

তৎকালীন সময়ে মুসলিম সমাজ শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। শামসুর রাহমানের পোগোজ স্কুলে ৮০০ ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ১০ জন। তার স্কুলের পথে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত রামমোহন লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে কৈশোরেই জ্ঞানের এক বিশাল জগত তার সামনে উন্মোচিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী'র মতো সাহিত্যপত্রগুলোর সাথে পরিচয়ও তার কাব্যপ্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। স্কুলজীবন থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্স কোর্সে পড়াশুনা শুরু করলেও ফাইনাল পরীক্ষা দেননি। ১৯৫৫ সালের ৮ জুলাই ঢাকার নবাব পরিবারের মেয়ে জোহরা বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার ২ ছেলে তিন মেয়ে। পাড়াতলির পুকুরে ডুবে ছোট ছেলের অকাল মৃত্যু হয়। তিন মেয়ের দু জন সপরিবার দেশের বাইরে থাকেন, একজন ঢাকায়। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু ও দুই নাতনী নয়না এবং দীপিতাকে নিয়ে ছিল তার সংসার। আর ছিল কবিতা। মৃত্যুর আগে তিনি ঢাকার শ্যামলীতে বাস করতেন।

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের প্রায় সবকটি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, মিতসুবিশি পুরস্কারসহ ভারতের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি।

পেশাজীবনের শুরুতে ১৯৫৭ সালে তৎকালীন ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ-এ সহ-সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই কাজে ইস্তফা দিয়ে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে কাজ নেন। কিন্তু কাজে মন বসাতে না পেরে আবার মর্নিং নিউজ-এ ফেরত যান এবং ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। ১৯৬৪ সালে দৈনিক পাকিস্তান (স্বাধীনতাত্তোর দৈনিক বাংলা)-এ সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। সরকারি এই কাগজে ১৩ বছর সম্পৃক্ত থাকার পর ১৯৭৭ সালে এর সম্পাদক হন। জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ১৯৮৭ সালে তিনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯ বছর বয়স থেকেই শামসুর রাহমানের কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। তার কবিতা 'উনিশ ঊনপঞ্চাশ' নলিনী কিশোর সম্পাদিত সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের দ্বারা কাব্যানুরাগী হতে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচয়ের সুবাদে তিনি ইয়েটস, ডিলান টমাস, এলিয়ট, এজরা পাউন্ড প্রভৃতি সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন ইয়েটস দ্বারা। বাংলা কাব্যে বিশেষভাবে তিনি প্রভাবিত ছিলেন জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-রীতি ও রচনা-শৈলীর দ্বারা। তবে জীবনানন্দ দাশের সাথে তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন এই জায়গায় যে জীবনানন্দের সমস্ত কাব্য পাঠ করলেও তৎকালীন বৃটিশ ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের ছবি কিংবা তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অন্যদিকে শামসুর রাহমানের কাব্যে-কবিতায় পাকিস্তানী প্রায়-ঔপনিবেশিক কাল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সেক্যুলার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা ও সামরিক স্বৈরশাসনবিরোধী সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায় সরব প্রতিবাদে কাব্যশৈলীতে খচিত হয়ে আছে।

জীবনানন্দের কাব্যে বাংলার যে রূপ ফুটে উঠেছিল তার চেয়ে ভিন্ন স্বাদে শামসুর রাহমান রচনা করেন – "এ-ও তো বাংলাই এক, তোমার ধ্যানের বাংলাদেশ/ হোক বা না হোক; আজো এখানে এ-বাটে দৈনন্দিন/ চলে আনাগোনা নানা পথিকের, মাঠে বীজ বোনে/ ধান কাটে কর্মিষ্ঠ কৃষক আর মাঝি টানে দাঁড়।/ ... বাংলার আকাশ তুমি, তুমি বনরাজি সমুদ্রের/ নির্জন সৈকতে তুমি অন্তহীন, তুমি বাউলের/ বিজন গৈরিক পথ, গৃহস্থের মুখর প্রাঙ্গণ,/ আমাদের ষড়ঋতু তুমি, তুমি বাংলার প্রান্তর।" (এ-তো বাংলাই এক : এক ধরনের অহংকার) আবার বাংলার ভিন্ন চিত্রে তার লেখা – "তোমার শরীর দেখি ছিঁড়ে খায় শকুন শেয়াল,/ তোমার উদাস বুকে পদধ্বনি শোকমিছিলের।/ কখনো তোমার খাঁ খাঁ বিবস্ত্র শরীর ঢেকে দেয়/ পতাকা ব্যানারে ওরা লজ্জাতুর তোমার সন্তান।/ মারীতে মরোনি তুমি, ম্যাকসিম গোর্কির জননীর/ মতো তুমি সংগ্রাম ও শান্তি করো হৃদয়ে ধারণ।" (হে বঙ্গ : দুঃসময়ের মুখোমুখী)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি প্রখর মুহূর্ত এবং ত্যাগে-সংগ্রামে দীপ্তিময় ঘটনাবলীকে তিনি সাজিয়ে গেছেন অশেষ আকুল প্রেরণায়। 'শিল্পের জন্য শিল্প' – এই মনোভাব থেকে সরে আসা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "যখন প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন চতুর্দিকে কড়া পাহাড়া বসিয়ে দিয়েছিলাম যাতে আমার কাব্যক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ না ঘটে। ... আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে আমার কাব্যপ্রয়াস একটা নতুন বাঁক নেয় বলে মনে করি। যে আমি ছিলাম পুরোপুরি বিবরবাসী অন্তর্জীবনে সমর্পিত, সে-আমি ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠলো বহির্জীবনের প্রতি মনযোগী এবং রাজনীতিমনস্ক। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুগত না হয়েই আমি রাজনীতি থেকে, গণসংগ্রাম থেকে শোষণ করে নিলাম আমার কবিতার নানা উপাদান।" সাহিত্যিক হুমায়ূন আজাদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, "তৃতীয় বিশ্বের কবিদের অনেক জ্বালা, অনেক বেদনাবোধ, এবং দায়িত্ববোধ আছে। যে জন্য ক্রমশ আমার কবিতা সেই ভেতরের পৃথিবী থেকে বাইরের পৃথিবীর দিকে গেছে – সামাজিক অনাচার অবিচার এবং স্বৈরশাসন, নানা ধরনের উৎপীড়ন, শৃঙ্খলাবদ্ধতা – এসবের বিরুদ্ধে আমার মন রিএ্যাক্ট করেছে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। আমার মনে হয়, আমার অনেক কবিতাতেই এর প্রকাশ ঘটেছে। ... একজন ব্যক্তিই কবিতা লেখেন, তার বিক্ষোভটা তার ব্যক্তিগত হলেও আমি যেহেতু নিঃসঙ্গ নই, আমার এ বিক্ষোভের মধ্যে অনেকের বিক্ষোভই প্রতিফলিত। সুতরাং আমার মনে হয়, সেটা আমার একার আর বিক্ষোভ থাকে না, অনেকের বিক্ষোভে পরিণত হয়। আমি এভাবেই দেখি।"

সেজন্য প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যথার্থই বলেছিলেন, "দেশ যখন জ্বলে ওঠে লেলিহান শিখায় ... মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করে রাজপথে মিছিলে ছুটতে ছুটতে যে কিশোর ঠ্যাঙারে বাহিনীর বন্দুকের সামনে বুক পেতে শুষে নেয় বন্দুকের শক্তিকে, তার শক্তির ওজন মেলে শামসুর রাহমানের কবিতায়।"

তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'তে রাজনৈতিক সংগ্রামের ছাপ তেমন পড়েনি। তবে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' থেকেই রাজনৈতিক সংগ্রাম তথা সমাজের বাস্তব চিত্র আলোকোজ্জল হয়ে উঠতে থাকে।

তিনি যে ক্রমাগত অন্তর্জীবন থেকে, আত্মমগ্নতা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তার নজির ওই 'রৌদ্র করোটিতে'-ই সমাজবিমুখ আত্মকেন্দ্রীক ব্যক্তিদের প্রতি শ্লেষভরা ভাষায় তিনি লেখেন – "মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ/ মনে চিন্তার নেইকো লেশ।/ ... জগৎ জোড়া দেখিস ঐ/ সবুজ চিকন ঘাসের দেশ।/ মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ।" (মেষতন্ত্র : রৌদ করোটিতে)

শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের ঘটনাবলীও তার মনে রেখাপাত করে। সেজন্যই ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার ছবি এঁকে তিনি লেখেন, "আমরা যখন ঘড়ির দুটো কাঁটার মতো/ মিলি রাতের গভীর যামে,/ তখন জানি ইতিহাসের ঘুরছে কাঁটা/ পড়ছে বোমা ভিয়েতনামে।" (প্রেমের কবিতা : নিরালোকে দিব্যরথ)

রবীন্দ্রনাথের পর স্বকীয় শৈলীতে এত বেশি সংখ্যক কবিতার লেখক দুই বাংলাতেই বিরল। নজরুলের মতো মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেওয়া শব্দমালার বলিষ্ঠ উচ্চারণে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী, বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো পংক্তিগুচ্ছের প্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রেরণা জাগানিয়া জীবন-সংগ্রাম ও বীর-গাথা সংকলিত করতে না পারলেও; কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যপ্তিতে অপরূপ ছন্দময় শিল্পশৈলীতে প্রকাশিত প্রকৃতি, জগৎ-জীবনের বহু ধারার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের সাথে দূরত্ব থাকলেও শামসুর রাহমান তার আপন রচনাছন্দ, কাব্যভাষা, ধ্বনিমাধুর্য্য, ইঙ্গিতময়তা ও প্রতীক নির্মাণে যথেষ্ঠ মাত্রায় স্বকীয়তা ও সাফল্য অর্জন করেছিলেন। 'রৌদ্র করোটিতে' কাব্যগ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন – "লোকে বলে বাংলাদেশে কবিতার আকাল এখন/ বিশেষতঃ তোমার মৃত্যুর পরে কাব্যের প্রতিমা/ ললিত লাবণ্যচ্ছটা হারিয়ে ফেলেছে"। সেই হারানো ললিত লাবণ্যচ্ছটা শামসুর রাহমান তার কাব্যে অনেকটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। সেজন্য পঞ্চাশের দশক থেকেই দুই বাংলার কবিতাপ্রেমীদের কাছে শামসুর রাহমানের কবিতা আকর্ষণ এবং কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' থেকে শুরু করে তিনি একে একে লিখে গেছেন রৌদ্র কারোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ে মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি, এক ধরনের অহংকার, আমি অনাহারী, শূন্যতায় তুমি শোকসভা, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে, মাতাল ঋত্বিক, ইকারুসের আকাশ, কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, নায়কের ছায়া, আমার কোনো তাড়া নেই, যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে, অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই, হোমারের স্বপ্নময় হাত, শিরোনাম মনে পড়ে না, ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই, ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ, এক ফোঁটা কেমন অনল, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে, অবিরল জলভ্রমি, আমরা ক'জন সঙ্গী, ঝর্ণা আমার আঙুলে, স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, মঞ্চের মাঝখানে, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো, সে এক পরবাসে, গৃহযুদ্ধের আগে, খণ্ডিত গৌরব, শুনি হৃদয়ের ধ্বনি ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ।

কবিতার বাইরে শামসুর রাহমানের পদচারণা কম থাকলেও অনুবাদ সাহিত্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক রচনা, শিশু সাহিত্য ইত্যাদিতেও তার বিশিষ্টতার ছাপ রয়েছে। অনুবাদ সাহিত্যে সামান্য কিছু সীমাবদ্ধতা ছাড়া তিনি বড় ধরনের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার অনূদিত গ্রন্থ সংখ্যা চার, দুটি নাটক ও দুটি কবিতার বই। নাটক দুটি বিখ্যাত দুই মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ওনীলের 'মার্কোমিলিনিয়াস' এবং টেনেসি ইউলিয়ামসের 'সামার এন্ড স্মোক'। কবিতার একটি বই লুই আন্টারমেয়ার কর্তৃক নির্বাচিত রবার্ট ফ্রস্টের পঞ্চাশটি কবিতার সংকলন। অন্যটি এই উপমহাদেশের মুলতানী (সেরইকী) ভাষার একজন বড় কবি ফরিদ-এর কবিতা।

কবি ফরিদের দুঃখ, বিরহ-বেদনা এবং আশা-ভরসার অভিব্যক্তি সমান দক্ষতায় অনুবাদে তুলে ধরেছেন শামসুর রাহমান। একদিকে – "সুখ তো বিমাতা আমার, তাই সে বিদায় সম্ভাষণও/ জানায়নি কোনো এমনকি প্রস্থানে/ দুঃখই জানি আমার আপন মাতা,/ করেছি তো পান অবিরল আমি তারই সে স্তন্যধারা।" অন্যদিকে – "পৃথিবীকে লাগে কেমন চপল,/ কেমন মধুর আজ/ ... ঘরে ফেরা সব গরুর ঘণ্টি/ শুনতে মধুর লাগে/ যা-কিছু রয়েছে এই চরাচরে/ আনন্দময় সবি/ অনাবাদী এই বসতি এখন/ পুষ্পে পাতায় ছাওয়া।" একইভাবে ফ্রস্টের জনপ্রিয় কবিতা 'স্টপিং বাই উডস অন এ স্নোয়ি ইভিনিং'-এর চমৎকার অনুবাদ আমরা পাই এইভাবে – "এই বন কার জানি বলে মনে হয়।/ বুঝি বাড়ি তার ঐ গাঁয়ে নিশ্চয়;/ জানবেনা সে তো দেখছি দাঁড়িয়ে আমি/ বন তার হলো এখন তুষারময়/ ... কাজল গভীর এ-বন মধুর লাগে/ কিন্তু আমার ঢের কাজ বাকী আছে।/ যেতে হবে দূরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে,/ যেতে হবে দূরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে।" একইভাবে নাটকেরও সার্থক অনুবাদের মাধ্যমে ভিনদেশী ভিন্নভাষী সাহিত্যিকদের সাহিত্যরস বাংলাভাষীদের কাছে তিনি অবারিত করে রেখেছেন।

রবীন্দ্র-নজরুল-সুকুমার-অন্নদাশঙ্কররা যেভাবে শিশু সাহিত্যের ভূবন দখল করে আছেন তার সীমানার মধ্যেই নববিন্যাসে শিশু সাহিত্য রচনায়ও তিনি শিশুদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তার ছড়া-কবিতার বইগুলো হচ্ছে 'এলাটিং বেলাটিং', 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো', 'গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে'। লৌকিক ঐতিহ্য মেশানো প্রাঞ্জল এই ছড়াগুলো – "আঁটুল বাঁটুল শামলা সাঁটুল শামলা গেছে হাটে,/ কুঁচবরণ কন্যা যিনি তিনি ঘুমান খাটে।/ খাট নিয়েছে বোয়াল মাছে, কন্যে বসে কাঁদে,/ ঘটি বাটি সব নিয়েছে, কিসে তবে রাঁধে?" এবং "আতা গাছে চারটি পাখি, ডালিম গাছে তিন –/ সাতটি পাখি মনের সুখে নাচে তা ধিন ধিন।/ সাতটি পাখি সাতটি সুরে গান গেয়ে যায় রোজ,/ আতা গাছে, ডালিম গাছে সুরের সে কি ভোজ!" – সহ বহু ছড়াই জনপ্রিয় হয়ে আছে।

তার স্মৃতিকথা 'স্মৃতির শহর' বইটিতে তিনি তার ভালোবাসার শহর জন্মভূমি ঢাকাকে ঘিরে ছোট-বড় সামান্য-অসামান্য বহু বিষয় এমনভাবে স্মৃতির মণিকোঠা থেকে হাজির করেছেন যার মধ্যে বুনট অতীত সময়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কীভাবে সময়ের বিবর্তনে সামন্ত মোঘল আমলের ছায়াচিত্র ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে তারও হদিস মেলে। পানির কল এসে ভিস্তিওয়ালাকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। কবির স্মৃতিতে মাহুতটুলীর পিঠেওয়ালা বুড়ি, আস্তাবলের হাড় জিরজিরে ঘোড়া ও ঘোড়ার সহিস, আর্মানিটোলা স্কুলের মাঠ, বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে মেঘমালার রঙিন চলচ্চিত্র দেখা, গভীর রাতে নিস্তব্ধ গলিতে আলীজান ব্যাপারীর খড়মের আওয়াজ, মাহুতটুলীর গলির এক তালিমারা ফতুয়া পরা বাতিওয়ালা, বাবুর বাজারের শিল্পী নঈম মিয়া – সবাই উপস্থিত। স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে কবি সেগুলো ধরে রাখতে পেরেছেন। তিনি লিখেছেন – "একদিন পানির কল এলো আমাদের ... মাহুতটুলীর বাড়িতে। আর সেই সঙ্গে বিদায় নিল ভিস্তি। ... সেদিন ভারী মন খারাপ হয়ে গেল আমার। পানির কল তো আর মজার মজার গল্প শোনাতে পারবে না। সেদিন বার বার মনে পড়ছিল ভিস্তির কথা। ... আমার কোনো আপনজন যেন চিরদিনের মতো চলে গেছে আমাদের এই চেনা দুনিয়া ছেড়ে। ... কোনো দিন সেই হাসিখুশী মুখের ছবি যাবেনা আমার মন থেকে, যেমন যাবে না নঈম মিয়ার মুখের ছবি আর তার নিজের আঁকা ছবি – সে গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি আর মেঘ-মেঘালি, সেই পালতোলা নৌকো, দূর থেকে দেখতে পাওয়া চর আর চরের উপর খয়েরী রঙের খড়ে ছাওয়া কাজল কুঁড়ে ঘর।"

শামসুর রাহমান বেশ কিছু আধুনিক গানও রচনা করেছেন। বাণীভঙ্গি এবং শব্দ চয়নে এ-ক্ষেত্রেও নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন। "মধুময় পৃথিবীকে নীল আকাশ ডাকবে,", "স্মৃতি ঝলমল সুনীল মাঠের কাছে,/ পানি টলমল মেঘনা নদীর কাছে/ আমার অনেক ঋণ আছে", "স্বাধীনতা তুমি আছো বলে/ গোলাপ চামেলী ফোটে/ আনন্দ কুঁড়ি ফোটে অবিরত/ খুকু মনিদের ঠোঁটে", "পদ্মে আমার প্রাণের ভাষা ব্যাকুল ডাকে,/ সূর্যোদয়ে শহীদের খুন জড়িয়ে থাকে" ইত্যাদি। এসব গানে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ, প্রেম ও নিঃসর্গের ছবি চমৎকারভাবে ব্যঞ্জয় হয়েছে।

শামসুর রাহমান জীবিকার ছকবাঁধা আর্থিক নিরাপত্তাভরা ঘেরাটোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন মানুষের প্রতি ভালোবাসার অঙ্গীকার থেকে। দুঃসময়ে, যখনই অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন, রাজপথে নেমেছেন বার বার। বুদ্ধিজীবী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতি আহ্বান রেখেছেন অন্ধকারে আলো জ্বালবার। দেশপ্রেমিক প্রগতিবাদী সাহসী তরুণ-যুবকেরা যখন সংগ্রামে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, শামসুর রাহমান তাদের প্রতি অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, ভাষা ও শিল্পশৈলীর শক্তিতে প্রেরণার উৎস হিসাবে তুলে ধরেছেন আপন কবিতায়।

কবি নিজেই বলেছেন যে আমাদের সংস্কৃতির উপর যে আঘাত এসেছিল পাকিস্তান আমলে, রাজনীতি নির্ভর না হলেও সে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি। কেননা আমাদের সংস্কৃতির প্রধান ভিত যে ভাষা সেই ভাষা "নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো তুমি আমার সত্তায়।"

'৫২-র ভাষা আন্দোলন ও ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে তিনি লেখেন, "আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে/ কেমন নিবিড় হ'য়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা/ একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় – ফুল নয়, ওরা/ শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।/ একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।/ ... বুঝি তাই উনিশশো ঊনসত্তরেও/ আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,/ বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।/ সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা,/ সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।" (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ : নিজ বাসভূমে)

১৯৬৯ সালে আইয়ুবীয় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের শহীদ প্রগতিশীল ছাত্রআন্দোলনের নেতা শহীদ আসাদের স্মৃতি চির ভাস্মর হয়ে আছে তার 'আসাদের শার্ট' কবিতায়। আসাদের রক্তমাখা শার্ট আমাদের প্রাণের পতাকা হয়ে ওড়ে তার কবিতায় – "গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের/ জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট/ উড়ছে হাওয়ার নীলিমায়।/ ... আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা/ সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;/ আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।" (আসাদের শার্ট : নিজ বাসভূমে)

১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে যখন দক্ষিণ বাংলায় প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে তখন পাকিস্তানী শাসকমহলের কেউ সহানভূতি জানাতেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসেনি। সেই সময় মজলুম জননেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার নেতা মাওলানা ভাসানীর ভূমিকা তুলে ধরে 'সফেদ পাঞ্জাবি' কবিতায় তিনি লেখেন, "... রৌদ্রলোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ় ঋজু,/ যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ/ সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি/ উত্তুরে হাওয়ায় ওড়ে।/ বুক তার বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার/ শবাকীর্ণ হু-হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের/ দৃশ্যাবলিময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা/ নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে/ সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ খাঁ/ দক্ষিণ বাংলাকে। .../ ... বল্লমের মতো ঝলসে ওঠে তার হাত বারবার,/ অতিদ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয়,/ মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি,/ যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব/ বিক্ষিপ্ত বে-আব্রু লাশ কী ব্যাকুল/ ঢেকে দিতে চান।" (সফেদ পাঞ্জাবি : দুঃসময়ের মুখোমুখী)

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধরত তরুণ গেরিলা যোদ্ধাদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন, "তুমি আর ভবিষ্যত যাচ্ছো হাত ধ'রে পরস্পর।/ সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ তাড়ানিয়া;/ তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।" (গেরিলা : বন্দী শিবির থেকে)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি আকুল আকুতি জানিয়ে তিনি লিখলেন, "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,/ তোমাকে পাওয়ার জন্যে/ আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?/ আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?/ ... এই বাঙলায়/ তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।" (তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা : বন্দী শিবির থেকে)

জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের অমর শহীদ নূর হোসেন তার বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দেন। তাকে নিয়ে 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কবিতায় তিনি লেখেন, "... অপরূপ সূর্যোদয়,/ কেমন আলাদা,/ সবার অলক্ষ্যে নূর হোসেনের প্রশস্ত ললাটে/ আঁকা হয়ে যায়,/ যেন সে নির্ভীক যোদ্ধা, যাচ্ছে রণাঙ্গণে।" (বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় : বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়) ১৯৯০ সালে এরশাদীয় সামরিক স্বৈরশাসনবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের এক বছর আগে অন্য একটি কবিতা 'আলো ঝরানো ডানা'য় লিখেছেন, "দু'দুটো বর্ষা বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশকে ধুইয়ে,/ কিন্তু আমি সত্যি দেখতে পাচ্ছি,/ ... নেকড়ের দাঁতের মতো/ বুলেটে ঝাঁঝরা ঐ যুবার বুকের রক্ত প্রবল/ বর্ষায় অবিরল জলও রাজপথ থেকে আজো/ মুছে ফেলতে পারেনি। প্রবালের মতো জ্বলছে/ রক্ত আর দেখছি ওর দুই কাঁধে/ গজিয়ে উঠেছে আলোঝরানো ডানা।/ ... নূর নূর নূর হোসেন বলে/ ডাকছে রাজপথ, নদীনালা, গাছপালা, নীলকণ্ঠ/ বাংলাদেশ। কখন আবার দশদিক/ ওলট পালট করে জেগে উঠবে নতুন যৌবন? (আলো ঝরানো ডানা)

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতি তত্ত্বীয় উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এদেশে ধর্মীয় বাতাবরণে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার যে চেষ্টা চলছিল তার বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক সেক্যুলার চেতনা নিয়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, কাব্য সাধনায় যারা এগিয়ে এসেছিলেন, কবি শামসুর রাহমান তাদের মধ্যে বিশিষ্ট। তিনি আজীবন অসাম্প্রদায়িক সেক্যুলার চেতনার মানুষ ছিলেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, মৌলবাদী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। সেজন্য ১৯৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি নিজ বাসভবনেই তিনি মৌলবাদী ঘাতকচক্রের হামলার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। সেবার তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান; কবি কিন্তু তারপরও থমকে যান নি, থেমে যান নি।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষতায় মৌলবাদী সংস্কৃতি ও শক্তির বিকাশ নিয়ে উদ্বিগ্ন শামসুর রাহমান কলম ধরেছিলেন, প্রতিবাদের মিছিলে নেমে এসেছেন রাজপথে বারবার। ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তার মনোভাব তিনি তুলে ধরেছেন এইভাবে – "বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। প্রত্যেকেরই নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার আছে, কিন্তু এই ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে অনেক ধর্মব্যবসায়ী অনেক ধরনের কাজ করছে, যেটা আমি মনে করি, দেশ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। ... এরা দেশের ক্ষতি করে, তবু মানুষ সেদিকেই ধাবিত হয়, কেননা আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব রয়েছে, অনেকেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এমনকি শুধু সাধারণ মানুষ নয়, নিরক্ষর মানুষ নয়, যারা শিক্ষিত তাদের মধ্যেও কুসংস্কার আছে। তারা ধর্মের বাহ্যিক দিকটার দিকে বেশী ধাবিত হয়, এর ফলে মৌলবাদী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠছে। এবং সেটা আস্তে আস্তে বিরাট আকার ধারণ করছে। এ সম্পর্কে যারা প্রগতিশীল এবং বিবেকবান মানুষ তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। ধর্ম যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে, সেটার কোন ক্ষতিকর দিক থাকতে পারে না, ... কিন্তু রিলিজিঅন যখন অর্গানাইজড হয়ে যায়, সুসংগঠিত হয়, তখনই ক্ষতি হয়। কেউ ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করলে আমি তার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু কেউ যদি ধর্মের নামে অধর্ম করে, এবং ধর্ম যদি অর্গানাইজড ফর্মে অধর্ম করতে থাকে, তখন আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই কথা বলবো। সব প্রগতিশীল বিবেকবান ব্যক্তিরই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।" তিনি আরও বলেছেন, "ধর্ম ছাড়াতো কোনো মানুষ নেই, আমি মনে করি আমার ধর্ম হলো মনুষ্যধর্ম, সেটা যদি বলেন, তবে আমি ধর্মপ্রবণ। কিন্তু প্রচলিত অর্থে যেটাকে ধর্মপ্রবণ বলা হয়, সে অর্থে আমি ধর্মপ্রবণ নই।"

'৭১-এ পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর ঘাতক বাহিনীকে পরাস্ত করে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। জনগণের সব অর্জন নস্যাতের পাশাপাশি শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী যখন নানা কায়দায় স্বাধীনতাবিরোধী এই রাজাকার শক্তিকে পুনর্বাসিত করে চলেছিল, তখন শামসুর রাহমান বিদ্রুপের কশাঘাতে ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষে লেখেন, "... হে দ্বীন ও দুনিয়ার মালিক, চোখের পলকে,/ হে-সর্বশক্তিমান, আপনি আমাকে/ এমন তৌফিক দিন যাতে আমি/ আপাদমস্তক মনে-প্রাণে একজন খাস রাজাকার/ হয়ে যেতে পারি রাতারাতি।" (একটি মোনাজাতের খসড়া : দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে)

বিনীত, মার্জিত, মৃদুভাষী কবি শামসুর রাহমান বিশ্বাস করতেন 'কবিতা মানুষের মনকে পরিশীলিত করে'। এটা ঠিক যে কবিতার ছন্দ মানুষের মনকে দোলায়িত করে। কিন্তু কবিতার গাঁথুনির মধ্যে যে কাব্যভাব লুকিয়ে থাকে এবং যে ভাব-চেতনা পাঠক শ্রোতাদের মনে আবেগ-আবেশ, অনুভূতি-প্রেরণা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সুরের দ্যোতনা সৃষ্টি করে – শ্রেণী ভাগ করা সমাজে কবি কিংবা পাঠক কেউ-ই কাব্যভাবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওই শ্রেণী-প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না। এ বিষয়ের সঠিক উপলব্ধি যে খুব জরুরী তার লেখায় সেটি তেমন তীক্ষ্ণভাবে ফুটে ওঠেনি।

তিনি বলতেন, "আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করি, আর ব্যক্তির বিকাশ, তার সৃজনশীল বিকাশের প্রতিও আমি বিশ্বাসী, এবং এ পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণ হোক এবং মানুষ প্রগতির দিকে এগিয়ে যাক – এ বিশ্বাস আমার আছে।" তিনি আরও বলেছেন, "আমি তেমন একটি সমাজে স্বস্তি বোধ করবো যেখানে মানুষকে অনাহারে থাকতে হবে না, মানুষের পরার কাপড় থাকবে, খাবারের নিশ্চয়তা থাকবে এবং তার ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন হবে না – এরকম সমাজে আমি থাকতে পছন্দ করবো যে সমাজ শোষণহীন এবং যেখানে দারিদ্র্যের নিপীড়নে মানুষ মারা যাবে না, এবং তার ব্যক্তিসত্ত্বাটা ক্ষুণ্ন হবে না।" কবির এই সুন্দর চাওয়াটা মহৎ। কিন্তু এ নিয়মশাসিত জগতে নিয়মের অনুশাসনের বাইরে কোন কামনা তা যত মহৎই হোক – বাস্তবে রূপ নেবার কোন পথ নেই।

সামন্তীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তির অধিকার বলে যখন কিছুই স্বীকৃত নেই, সামন্ত স্বৈরতান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তির বিকাশের সকল রাস্তা রুদ্ধ, সামন্তীয় বিলাস-ব্যসন এবং ব্যক্তিগত ভোগকেন্দ্রিক উৎপাদনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যখন ব্যক্তিজীবন সীমিত, তখন ব্যক্তির বিকাশের আন্দোলনের সাথে সমাজের বিকাশের প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু সমাজবিকাশের অমোঘ নিয়মেই বুর্জোয়া বিপ্লবের আঘাতে সামন্তীয় সমাজ ভেঙে যখন সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তি মালিকানার অসঙ্গতির মধ্যে মানুষের জীবনকে নতুনভাবে বাঁধা হল এবং পুঁজিবাদ অবাধ বিকাশের স্তর অতিক্রম করে একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করল তখন স্বাভাবিক নিয়মেই যৌথ সামাজিক আন্দোলন বিকাশের সাথে ব্যক্তির বিকাশের প্রশ্নটি জড়িয়ে গেল। মজুরি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সাথে ব্যক্তির মুক্তির বিষয়টি গাঁথা হয়ে গেল।

এক্ষেত্রে শোষণমুক্ত কল্পনার রাজ্য তথা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের অসার অসঙ্গতিপূর্ণ ধারণার বদলে ইতিহাস নির্ধারিত বিজ্ঞানসম্মত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শের মাধ্যমে কীভাবে সত্যিকার মানবমুক্তি, শোষণমুক্তির পথ রচিত হয়ে আছে সে বিষয়ে শামসুর রাহমানের সঠিক উপলব্ধির ঘাটতির কারণে তিনি বর্তমান সময়ের দুঃখ-জ্বালা, শাসকশ্রেণীসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর শোষণ-পীড়ন-নির্যাতনে ক্ষতি-বিক্ষত হলেও, মানবিক প্রেমে-আবেগে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে সকলকে উদ্বেলিত করতে পারলেও, সকল শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তির আরও সুন্দর ভবিষ্যতের সঠিক দিশা তুলে ধরতে অসমর্থ হয়েছেন।

মৌলবাদ ও স্বৈরতন্ত্র যে বর্তমানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই এপিঠ-ওপিঠ, বুর্জোয়া দ্বিদলীয় শাসনে বুর্জোয়াদের একটি দল মৌলবাদ বা স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ালে, বিপক্ষে যে দল দাঁড়ায় সে-ও যে গণতন্ত্রের ভেকধারী স্বৈরতন্ত্রী এবং সে-ও যে গণমুক্তির পক্ষে বাধা এটা তিনি ধরতে পারেন নি। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে সকলের জন্য গণতন্ত্র নয়, মুষ্টিমেয়র গণতন্ত্র এটা বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে যা নেই, তিনি খানিকটা তাই দেখেছেন। যথার্থ গণমুক্তির জন্য বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা তার উপলব্ধিতে ধরা পড়েনি।

তিনি বলেছেন, "উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে আমার সংযোগ খুব কম। ... আমি নিম্ন মধ্যবিত্তকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। তবে সর্বহারা বলতে যাদের বোঝায় তাদের সঙ্গে বসবাস করিনি, তবে যতটুকু দেখেছি তাতে বলা যায় আমার এক ধরনের পরিচয় তো আছেই। আমি বুঝতে পারি, নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রা থেকে তাদের জীবন কত দুঃসহ।" শোষিত সর্বহারাশ্রেণীর এই দুঃসহ জীবনের প্রতি গভীর মমতা সত্ত্বেও তাদের পথের সন্ধানের ছবি আঁকতে কিংবা জোরালো ইঙ্গিত আভাস দিতে পারেন নি। শামসুর রাহমানের জীবন সংগ্রাম ও কাব্য প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং শিক্ষা নিয়ে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আগামী দিনে সাহিত্যসেবীরা এগিয়ে আসবেন এই প্রত্যাশ্যা করি। সবশেষে শামসুর রাহমানকে আবারও গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

"আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হ'য়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা একা হেঁটে
যেতে যেতে মনে হয় – ফুল নয়, ওরা শহীদের ঝলকিত
রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর। একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের
চেতনারই রঙ।"